মিস্টিক রাশিচক্র

অদ্রীশ বর্ধন

ক্রিস্ট্যাল গোলকের দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর বয়সের গাছ-পাথর নেই। কপালের অসংখ্য ভাঁজ খেয়ে খেয়ে যেন সমুদ্রতটের আকৃতি নিয়েছে। সময়ের ঢেউ বুঝি ললাটের সৈকতে একটার পর একটা কুঞ্চন আগিয়ে গেছে।

কোলাটে দুই চোখে সম্মোহনের ঘোর। তিনি চোখ মেলে আছেন, কিন্তু যেন তাঁর ভেতরে অন্য একটা সত্তা সূচীতীক্ষ্ণ চাহনি মেলে রয়েছে প্রভাময় স্ফটিক গোলকের দিকে।

ইনি দীর্ঘকায় পুরুষ। শিরদাঁড়া সটান শিখে করে বসে থাকার জন্যেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। এঁর গাল জুড়ে ধবধবে সাদা দাড়ি লম্বা হয়ে নেমে এসেছে বুকের ওপর। চিবুক অদৃশ্য শ্বেতশ্মশ্রুর জঙ্গলে।

বৃদ্ধের গায়ে সাদা আলখাল্লা। গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত। সাদা ট্যাসেল দিয়ে বাঁধা কোমরের কাছে। দুই হাত ন্যস্ত হাঁটুর ওপর। মোটামোটা আঙুল—মানুষটা যে কত বলিষ্ঠ, তা বোঝা যায় ওই আঙুল, বুকের ছাতি, আর চওড়া কাঁধ দেখে।

বৃষস্কন্ধ এই অতিবৃদ্ধ যেন এখন ভাবের জগতে অবস্থান করছেন। বিশফুট বাই বিশফুট ঘরটার কোণে কোণে অন্ধকার বিরাজ করছে। রহস্যময় চিত্রলিখনে বোঝাই রঙচঙে দেওয়ালগুলো আঁধারে বিলীন হয়েও হতে পারছে না দুটো প্রকাণ্ড মোমবাতির জন্যে।

মোমবাতি দুটো জ্বলছে অতিবৃদ্ধের দু'পাশে—দুই হাঁটুর পাশে। যেহেতু ঘরের বাতাস নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে রয়েছে, তাই মোমশিখা নিষ্কম্প।

বিশাল স্ফটিক গোলকের ভেতরে ফুটে ওঠা মূর্তিটাকে তাই সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্বচ্ছ গোলকের মধ্যে যেন ঘষা কাচ দিয়ে গড়া এক মূর্তি। সুদেহী, সুদর্শন। যেন গ্রীক মূর্তি। পাথর কুঁদে গড়া। দুই চোখে স্বপ্নিল দৃষ্টি। পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। চুনোট করা কোঁচার খুঁট পাঞ্জাবির বাঁ পকেটে।

স্বপ্নের ঘোরে বললেন অতিবৃদ্ধ—

ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র। আমার প্রাইভেসি রক্ষা করতে পারবে শুধু এই মানুষটা। একেই আমার দরকার। এক ঘণ্টার মধ্যে। ঠিক এক ঘণ্টা। আমার নাড়ি স্তব্ধ হবে ঠিক এক ঘণ্টা পরে। শুভ্র, ঘড়িতে এখন কটা বাজে?

এবার দেখা যেতে পারে শুভ্র নামক কিশোরকে। নিঃসন্দেহে এই অতিবৃদ্ধের নাতি। অবিকল সেই মুখাকৃতি, ঋজু দেহ। খুব ফর্সা। চোখ কালো। চাহনি উদ্বিগ্ন।

বৃদ্ধের ঠিক পেছনে আলো-আঁধারির মধ্যে এতক্ষণ সে ছিল যেন অদৃশ্য।

এখন বললে, সাতটা!

অতিবৃদ্ধ বললেন, আটটায় থেমে যাবে আমার নাড়ির স্পন্দন। আমি চলে যাব। আমার ধনরত্নের হদিস তার আগেই দিয়ে যেতে চাই—এই ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে। নির্লোভ, সত্যসন্ধানী মানুষ। শুভ্র, তোকে বলব না। বড় ছেলেমানুষ। কুবেরের

সম্পদ তোকে বিপদে ফেলবে। যা। ডেকে আন। আটটার আগেই নিয়ে আসবি। যা, যা, যা।

বেগে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো শুভ্র নামক কিশোর।

নিবাত নিষ্কম্প অতিবৃদ্ধ চোখের পাতা না কাঁপিয়ে স্ফটিক গোলকের মধ্যে ভাসমান ঘষা কাচের মূর্তির মতো ইন্দ্রনাথ রুদ্রের দিকে তাকিয়ে মন্দ্রমন্থর কণ্ঠে তখন বলছেন, আসুন, আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করুন। অনেক জ্ঞান নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি, রেখে যাচ্ছি অনেক হীরে-মানিক যার কোনও দায় আমার কাছে নেই, কিন্তু যা বিষ হয়ে উঠতে পারে আমার নাতির কাছে। আসুন, আসুন, আসুন, ঠিকানা আপনি বের করুন। আপনি পারবেন। পারবেন। পারবেন।

ঠিক এই সময়ে দু'হাতে দুই রগ টিপে ধরে মুখ নিচু করে ছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র ওর বেলেঘাটার বাড়িতে।

আমরা রবিবাসরীয় আড্ডায় বসেছিলাম। আমরা তিনজন—আমি, কবিতা, ইন্দ্রনাথ।

কবিতা বলেছিল, কি হলো, ঠাকুরপো?

ইন্দ্রনাথ বললে, রগ দুটো হঠাৎ চিনচিন করে উঠল।

আমি বললাম, প্রেসার বেড়েছে।

থট প্রেসার। খোঁচা দিয়েছিল কবিতা, খারাপ কাজ আর খারাপ লোকদের নিয়ে অত ভাবলে প্রেসার তো বাড়বেই।

টেলিফোন মুখর হয়েছিল সেই সময়ে।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র? তৈরি হয়ে থাকুন। দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। গাড়িতে যেতে যেতে বলব...কি বললেন? প্রেসার বেড়েছে? আচমকা? ওটা থট প্রেসার। আমার দাদু যে আপনার কথা ভাবছেন...পাওয়ারফুল ক্লেয়ারভয়ান্ট... আসছি।

উল্কাবেগে গাড়ি ছুটছে। ঘড়ি দেখছে শুভ্র। সময় এখন সাড়ে সাতটা।

আপনার দাদু ক্লেয়ারভয়ান্ট? ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

হ্যাঁ। এক্সট্রিমলি পাওয়ারফুল। এ.সি. গাড়ির চালক শুভ্র স্বয়ং। চোখ সামনের দিকে। ঠোঁট শক্ত। ওরা দুজনে সামনের সিটে পাশাপাশি। আমি আর কবিতা পেছনে।

এখনও রগ চিনচিন করছে।

এখনও আপনাকে ডাকছেন নিশ্চয়।

কেন?

কুবের সম্পদের ঠিকানা শুধু আপনাকে জানাবেন।

গুপ্ত সম্পদ?

হ্যাঁ।

থট প্রেসার দিয়ে আমার মাথাটাকে জখম করছেন কেন?

সময় আর নেই বলে।

মানে?

ঠিক আটটায় ধরাধাম ত্যাগ করবেন দাদু।

ইচ্ছামৃত্যু নাকি?

আয়ুর ঘড়িতে বালি ফুরিয়ে যাবে ঠিক ওই সময়ে।

জবাবটা স্পষ্ট হলো না। উনি কি খুন হবেন ঠিক আটটায়?

নিয়তি প্রাণ হরণ করবে ঠিক আটটায়।

কে বলেছে?

দাদু। উনি নাড়ী-বিজ্ঞান জানেন।

নস্ত্রাদামুস-ও নিজের মৃত্যুর সময় আর তারিখ ভুল বলেছিলেন।

জানি। ১৫৬৭ সালের নভেম্বর মাসের বদলে ১৫৬৬ সালের জুলাই মাসে দেহ রেখেছিলেন। তিনি নাড়ী-বিজ্ঞান জানতেন না। শুধু কৃস্ট্যাল-গোলকের দিকে তাকাতেন। তারিখের চেয়ে ঘটনাকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। উনি মহামুনি কণাদ বিরচিতম্ নাড়ী-বিজ্ঞানম্ পড়েননি। প্র্যাকটিস করেননি। দাদু করেছেন।

সেই সঙ্গে অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতির অধিকারী হয়েছেন?

হ্যাঁ। সময় ফুরিয়ে এল...এসে গেছি।

গাড়ি উল্কাবেগে সিংহতোরণ দিয়ে ঢুকে সশব্দে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি-বারান্দায়।

সময় তখন সাতটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট।

আটটা বাজতে যখন দু-মিনিট, আমরা ঢুকলাম পাতাল-ঘরে—কৃস্ট্যাল গোলকের ঘরে।

ইন্দ্রনাথকে পাশে নিয়ে শুভ্র এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল অতিবৃদ্ধের সামনে।

অর্ধ-নিমীলিত চোখে অর্ধস্বচ্ছ স্ফটিক-গোলকের দিকে চেয়েই রইলেন তিনি। স্ফটিকের মধ্যে বুঝি কুয়াশার ঘূর্ণাবর্ত। গোলাপি কুয়াশা। অস্বচ্ছ গোলক।

অতিবৃদ্ধ চোখ ফেরালেন না। কোলের ওপর দু-হাত যেভাবে রেখে দিয়েছিলেন, সেইভাবেই রেখে দিলেন। যে রকম নিস্পন্দ ছিলেন, সেই রকম নিস্পন্দ রইলেন।

ঘর নিস্তব্ধ।

ঠিক আটটার সময়ে অতিবৃদ্ধের দু-চোখের পাতা পুরো বুঁজে গেল। মাথা হেলে পড়ল পেছনে।

শেষ। বললে শুভ্র।

কিন্তু কিছু তো বলে গেলেন না। প্রশ্ন ইন্দ্রনাথের।

লিখে গেছেন।

হাতে ধরা কাগজে?

হ্যাঁ।

মোমবাতি দুটো এখনও জ্বলছে। জ্বলে জ্বলে শেষ হবে, তখন নিভবে। ঘর মোমপোড়া ধোঁয়া আর গন্ধে ভরে গেছে। যেন ঘন কুয়াশা। কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না।

মাথার ওপর বড় আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে শুভ্র।

অতিবৃদ্ধের হাতে আলতো করে যে কাগজটা ধরা ছিল, শুভ্র তা এনে দিয়েছে ইন্দ্রনাথের হাতে। আলোর তলায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ পড়ছে কাঁপা-কাঁপা লেখা—

আলাদিনের নাচ দেখনি?
তুরুক তুরুক নাচ?
সপ্তলোকে নেচে এসে
অষ্টম লোকে কাৎ?
নবগ্রহে তবুও নৃত্য
ভীষণ বিষম নিবাত নৃত্য
দেখে শুনে চিঁ-চিঁ করেন
দশ দিকপাল—
নৃত্য চলে, তবুও চলে
সাত দিকপালের জঠর খোলে—
আলাদিনের লম্ফ জ্বলে
গুহা চিচিং ফাঁক?

বিচিত্র ছড়া আমাদের চারজনের হাতে হাতে ঘুরে এল। তিনজন চাইলাম

আলোর তলায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ পড়ছে কাঁপা কাঁপা লেখা

একজনের মুখের দিকে। ইন্দ্রনাথের দিকে।

সে তখন দু'হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে, চুনোট করা কোঁচা লটপটিয়ে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে চেয়ে আছে ঘরের কড়িকাঠের দিকে।

গম্বুজ ছাদ। অনেক উঁচুতে ঝুলছে বিদ্যুৎবাতি। সেই আলোয় সিলিং জুড়ে আঁকা বিচিত্র ছবি দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে চার দেওয়ালের উদ্ভট তাসগুলোকে।

সাধারণ তাসের ছবি নয়। কিম্ভূত ছবির পর ছবি।

ট্যারট তাস, অস্ফুট স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ।

হ্যাঁ, মৃদুতর কণ্ঠে বললে শুভ্র, উনি ট্যারট বিশারদ ছিলেন।

মিস্টিক্যাল কার্ড। হাজার হাজার বছর আগে চালু ছিল ঈজিপ্টে।

ডেভিলস কার্ড, শুভ্র কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে এনেছে।

কিন্তু বিশ্বাস করতেন সম্রাট নেপোলিয়ন।

জানি। তাঁর নিজেরই তো ছিল 'বুক অফ ফরচুন'। ভীষণ জটিল।

শুভ্র, অনেক খবর রাখো। মূল ট্যারট কার্ড কটা ছিল জানো?

আটাত্তরটা। এই দেওয়ালে আঁকা আছে। দেখেছেন?

ডানদিকের দেওয়াল জুড়ে লাইনবন্দী রকমারি রঙে আঁকা বীভৎস ছবির পর ছবি। পরী, দেবী, কঙ্কাল, দানব আরও কত কী।

শুভ্র বলছে, এই দিকের দেওয়াল দেখুন, মাইনর আর্কানা-র ৫৬টা কার্ড।

বাঁ দিকের দেওয়াল জোড়া সারি সারি কিম্ভূতকিমাকার ছবি।

শুভ্র বলে যাচ্ছে, সামনের দেওয়ালে কিন্তু মেজর আর্কানা-র ২২টা কার্ড। সবই ভবিষ্যৎ বলার গুপ্ত বিদ্যা।

ঘুরে ঘুরে ধোঁয়াভরা ঘরে দাঁড়িয়ে অজস্র তাসের ছবি-সমাহার দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথ বলছিল, উনি বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন কি ট্যারট তাসের দৌলতে?

না, বললে শুভ্র, উনি অতীন্দ্রিয় নয়নের অধিকারী ছিলেন। আমাকে বলতেন, শুভ্র, এই ভারতবর্ষে যখন ব্যাঙ্ক ছিল না, যখন লুঠেরাদের অত্যাচার ছিল সর্বত্র, তখন মণিরত্ন সোনাদানা মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা হতো। ঠিকানা জানত শুধু মালিক। তিনি খুন হয়ে গেলে, সেই রত্নভাণ্ডার মাটির তলাতেই থেকে যেত। আমি কিন্তু থাকতে দিইনি।

উনি থাকতে দেননি?

না। এই কৃস্ট্যাল গোলক সঙ্গে নিয়ে উনি ঘুরেছেন বিশেষ বিশেষ জায়গায়। রত্নভাণ্ডার দেখেছেন স্ফটিক-গোলকে—তুলে এনেছেন মাটির তলা থেকে। কিন্তু জমিয়ে রেখেছেন এমন এক জায়গায়, যেখানকার ঠিকানা কাউকে বলেননি। আমাকেও না।

কেন?

অভিশপ্ত বলে। হেসে বলতেন, যক পাহারা দিয়েছে এত বছর ধরে। অভিশপ্ত রত্নভাণ্ডার। ভোগে লাগাতে গেলেই মরবে।

কিন্তু ঠিকানা লিখে গেছেন এই আবোলতাবোল ছড়ার মধ্যে?

হ্যাঁ। যাতে ধাঁধার জট খুলে, রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করে, গরিবদুঃখীর উপকার করতে পারেন।

আমি?

হ্যাঁ, আপনি। কারণ, আপনি নির্লোভ। দয়াময়। দাদু আমাকে বলেছেন।

বড় নিঃশ্বাস ফেলে চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

লক্ষ্য করলাম, অকস্মাৎ উজ্জ্বল হলো ওর দুই চক্ষু। দৃষ্টি ঘুরে এল ঘরময়। তন্নতন্ন তালাস করছে মেঝের প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি।

শুভ্র কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, কিছু পেলেন?

হ্যাঁ।

কী?

প্রথম, মেঝেতে আঁকা হয়েছে একটা অদ্ভুত রাশিচক্র। বারোটা খুপরিতে লেখা বারোটা ইংরেজি মাসের নাম।

চোখ নামালাম। দেখলাম সেই বিচিত্র রাশিচক্র।

চতুষ্কোণ মেঝেতে ঠিক সেন্টারে বসানো স্ফটিক গোলক।

আমি বললাম, ইন্দ্র, দ্বিতীয় কি পেলে?

ইন্দ্র বললে, চার দেওয়াল থেকে মেঝে খুব অল্প ঢালু হয়ে এসে মাঝের চতুষ্কোণে ঠেকেছে। মাঝের চতুষ্কোণ সমতল। ইস্পাতের গোলপটি দিয়ে বাঁধানো।

আমি বললাম, কারণ ওখানে রয়েছে স্ফটিক গোলক। গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ইন্দ্রনাথের কণ্ঠে হেঁয়ালি।

যথা?

ইউরোপের বেশির ভাগ ভাষায় মাসগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে দেবদেবীদের নাম অনুসারে। কিন্তু সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর এসেছে যে চারটে ল্যাটিন শব্দ থেকে, তারা হলো সাত, আট, নয়, দশ যথাক্রমে।

তাতে কি প্রমাণিত হলো?

আমার কথার জবাব না দিয়ে কবিতার দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র বললে, বৌদি কিছু বুঝলে?

কবিতার চোখে দেখলাম শুকতারার ঝিকিমিকি। বললে, গোপন ভাণ্ডারের ঠিকানা ওই মাঝের চতুষ্কোণ।

কেন? ইন্দ্রনাথের চোখে খুশি উপচে পড়ছে।

সাত, আট, নয়, দশ তো ওই আবোলতাবোল ছড়ার মধ্যেই আছে।

সাবাস! কে বলে মেয়েদের বুদ্ধি নেই! এবার আমি বলছি...বলব, বৌদি?

বলো।

ছড়ার মধ্যে সপ্তলোক, অষ্টমলোক, নবগ্রহ, দশ দিকপাল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সাত, আট, নয় আর দশের ঘরে যাতে নজর ঘুরে যায়—সেইজন্যে। ওই চারটে ঘর রয়েছে মাঝখানে—সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর। তাই তো বৌদি?

হ্যাঁ।

ছড়ার মধ্যে নিবাত শব্দটা ইঙ্গিতময়। নিবাত কবচ একটা অভেদ্য কবচ, যারা ধারণ করে তারা দৈত্যগণ বিশেষ। এখানে অভেদ্য বলতে বোঝানো হয়েছে মাঝের চতুষ্কোণ। ঠিক বলছি?

কবিতা হাসিমুখে প্রোজ্জ্বল চোখে বললে, বিলকুল ঠিক।

ইন্দ্র বললে, দশ দিকপালের সপ্তমজন কে?

আমি আমতা আমতা করছি দেখে ফস করে বলে দিল কবিতা, কুবের।

গুড, গুড, ভেরি গুড। ছড়ায় আছে, সাত দিকপালের জঠর খোলে। মানে সপ্তম দিকপালের জঠর খোলে। মানে—

এবার আমি বললাম, কুবেরের জঠর খোলে।

রাইট। কুবেরের রত্নভাণ্ডারের জঠরের দরজা মাঝের এই চতুষ্কোণ। ঘরের চারদিকের মেঝে ঢালু রাখা হয়েছে ইচ্ছে করেই। ইস্পাতের পটির ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে জোড়ের জায়গা। শুভ্র।

বলুন।

কৃস্ট্যাল গোলক আর মোমবাতি সরিয়ে দেওয়ালের ধারে রাখো। দামী জিনিস। ভেঙে না যায়। ঠিক আছে। এবার দাদুকে গদি চেয়ার সমেত ঠেলে দেওয়ালের ধারে নিয়ে রাখো। ঠিক আছে। এবার এসো মাঝের চতুষ্কোণে। সেপ্টেম্বরে আমি, অক্টোবরে শুভ্র, নভেম্বরে মৃগাঙ্ক—নভেম্বরেই তো তোমার জন্ম, তাই না মৃগাঙ্ক? ডিসেম্বরে বৌদি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত ধরো। চক্র হলো সমাপ্ত। কিছু বুঝছো?

কবিতা বললে, পায়ের তলায় চতুষ্কোণ দুলছে।

জঠরের কপাট নড়ছে। চারজনের ওয়েট তো কম নয়। এবার...এবার...তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে চারজনেই শূন্যে লাফিয়ে উঠে একসঙ্গে দমাস করে দু'পায়ে লাথি মারবে চতুষ্কোণ মেঝেতে। এক...দুই... তিন... লাফাও।

চারমূর্তি একযোগে হাত ধরাধরি করে শূন্যে লম্ফ দিয়ে যখন চতুষ্কোণ মেঝেতে অবতীর্ণ হলাম, তখন আমাদের সম্মিলিত পদাঘাতে জায়গাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে লিফটের মতো নিচে নেমে গেল।

অমনি অটোমেটিক আলো জ্বলে উঠল পটাপট করে পায়ের তলায়। ধেই ধেই নাচ অব্যাহত রাখলাম আমরা। চতুষ্কোণ মেঝে সাঁ-সাঁ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে এসে দমাস করে ঠেকে গেল তলদেশে।

চোখ ধাঁধিয়ে গেল চারপাশের রোশনাইতে।

কানের কাছে শুনলাম ইন্দ্রনাথের হুকুম, খবরদার! মঞ্চ থেকে নেমে রত্ন ছুঁতে যেও না—হাল্কা হলেই উঠে যাবে মঞ্চ, যক হয়ে থাকতে হবে আলাদিনের গুহায়।

চারিদিকে জ্বলছে যেন অজস্র আলাদিনের লম্ফ। রত্নজ্যোতি।

গুহা চিচিং ফাঁক।

ছবি: সুবি

জানা-অজানা

শান্তনু খাটুয়া

বৃহত্তম রেল স্টেশন

পৃথিবীর সবথেকে বড় রেল স্টেশনটি আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নিউইয়র্ক শহরের গ্রান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল স্টেশনটি ১৯০৩ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল। আটচল্লিশ একর জমির উপর এই টার্মিনালটি গড়ে উঠেছে। এই দোতলা স্টেশনের ওপরতলায় আছে ৪১টি রেললাইন। একতলায় ২৬টি রেললাইন। দৈনিক গড়ে এই স্টেশনে ৫৫০টি ট্রেন এবং ১,৮০,০০০ যাত্রী যাতায়াত করেন। ১৯৪৭ সালের ৩ জুলাই একদিনে ২,৫২,২৮৮ জন যাত্রী সমাগমের রেকর্ডও আছে, যা পৃথিবীর আর কোনো রেল স্টেশনে কোনও দিন হয়নি।